পারস্পরিক শ্রদ্ধা মানে, শিক্ষকও ছাত্রকে সম্মান করবেন

সাক্ষাৎকার

মৈত্রীশ ঘটক

অর্থনীতিবিদ

সাক্ষাৎকার মহুয়া সাঁতরা

আপনি কি ছোটোবেলা থেকেই এমন সিরিয়াস? দুষ্টুমির ঘটনা নেই একটাও?

না না একেবারেই না। বাড়িতে, পারিবারিক মহলে, স্কুলে—সব জায়গাতেই বেশ দুষ্টু বলেই পরিচিত ছিলাম। দুষ্টু কিন্তু দুরন্ত নয়। নানা রকম দুষ্টুবুদ্ধি মাথায় ঘুরত। পিসতুতো ভাইবোনদের নানারকম ভুলভাল বুদ্ধি দিতাম, তারপর তা নিয়ে গণ্ডগোল বাধত। কলকাতার পাঠভবন স্কুলে পড়তাম। ক্লাস ফোরে যখন পড়ি, একবার ক্লাস-টিচার মাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। মা গিয়ে জানতে চাইলেন কী হয়েছে। উনি বললেন যে ক্লাসে ও এমন মজার মজার কথা বলে, সবাই হাসে, উনি কন্ট্রোল করতে পারেন না। মা তো বলাই বাহুল্য মোটেই খুশি হননি। আমার ওপরে তো বিরক্ত হলেনই, টিচারের ওপরেও বিরক্ত হলেন, যে মা বাড়ি থেকে কীভাবে ক্লাসের হাসাহাসি বন্ধ করবেন! মা বললেন, আপনি যেমন ইচ্ছে শাস্তি দিতে পারেন। পরের সাতদিন আমাকে ক্লাসের বাইরে বসতে হয়েছিল।

হাঃ হাঃ হাঃ...আর কোনও গল্প?

হয়তো স্কুলে কোনও টিচারের এমন মজার নাম বার করলাম, সেটা ছাত্র মহলে বেশ জনপ্রিয় হল, কালক্রমে একদিন সব ব্যাপারটা জানাজানি হল এবং যথারীতি আমার দিকেই আঙুলটা উঠল, যে এ নামটা বার করেছে। তারপর, বহরমপুরে আমার পৈতৃকবাড়ি। ছুটির সময় আমরা সব পিসতুতো-খুড়তুতো ভাই-বোনেরা জড়ো হতাম। কারও বাড়ি বেল বাজিয়ে পালিয়ে যাওয়া-টাওয়া, গাছ থেকে ফল পাড়া গোছের ব্যাপারগুলো তো ছিলই। একবার ঝড়ে একটা আমগাছ ভেঙে পড়ল। পাড়ার ছেলেরা সব আম কুড়োচ্ছে। আমার ঘরের বাইরে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা। কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল আমি ফ্রিজ থেকে বরফ বার করে

ছোটো বয়সে নানা ধরনের চিন্তা-ভাবনার দিক খুলে দেবার জন্য আমি আমার স্কুল পাঠভবনের কাছে কৃতজ্ঞ। পাঠভবনে এমনিতে একটা সাংস্কৃতিক বাতাবরণ ছিল। তবে তার মধ্যে রাবীন্দ্রিক প্রভাব খুব প্রবল ছিল, যেমন, প্রতি সকালে অ্যাসেম্বলি লাইনে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হত।

পাড়ার ছেলেদের দিচ্ছি, আর তারা তাদের কুড়োনো আম আমাকে দিচ্ছে! মানে বার্টার সিস্টেম আর কী!

সিরিয়াস হয়ে গেলেন কবে থেকে?

১৪-১৫ বছর বয়স থেকে একটা পরিবর্তন এল। ছোটোবেলা থেকে গল্পের বই পড়ার নেশা। কিন্তু স্কুলের পড়াশোনা আমার কোনওকালেই ভালো লাগত না। সত্যিই লাগত না। আমার মা কলেজের অধ্যাপক ছিলেন ও বেশ ডিসিপ্লিন্ড মাইন্ডসেটের মানুষ। মাধ্যমিক পর্যন্ত যেটুকু আমার রেজাল্ট ভালো হয়েছে সেটা খানিকটা মায়ের কড়া শাসনে। তবে স্কুলেও কিছু কিছু বিষয় ভালো লাগত। যেমন আমার বাংলা এবং ইংরেজি সাহিত্য দুই-ই ভালো লাগত। কিন্তু সাবেকি ধাঁচে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বা রচনা লেখা—তাতে এই জন্যেই কবিগুরু বলিয়াছেন বলে একটা উদ্ধৃতি দেওয়া বা 'একটি বর্ষণমুখর সন্ধ্যা' গোছের বিষয়ে রচনা লিখতে দিলে তাতে চারটে কবিতার লাইন, একটু মন খারাপ উদাস উদাস ভাব আনা এই ব্যাপারগুলো বেশ একঘেয়ে ঠেকত। তবে আমি যেহেতু কলকাতার পাঠভবন স্কুলে পড়তাম, আমাদের স্কুলে দুষ্টুমি করলে শাস্তি যেমন পেতে হত তেমন আবার সৃজনশীলতার পরিচয় দিলে প্রশ্রয়ও দেওয়া হত। অনেকসময় বিষয় ভালো লাগলে বা মুড এসে গেলে রচনা লেখার সময় বেশ উৎসাহ পেতাম, আর লেখার শৈলীর জন্যে বা কল্পনা বা রসবোধের ছাপ পেলে শিক্ষকেরাও উৎসাহ দিতেন, ক্লাসে আলাদা করে উল্লেখ করতেন বা সেই লেখা থেকে পড়ে শোনাতেন।

যেমন ওই 'একটি বর্ষণমুখর সন্ধ্যা' রচনায় আমি পরশুরামের গল্পের মতো একবার লিখেছিলাম, ভূতেরা এসে গেছে, তাণ্ডব শুরু করেছে!
মা আমার স্কুলের টিচারদের জিজ্ঞাসা করতেন, যে কই আপনারা এত বুদ্ধিমান- টান বলেন, রেজাল্ট তো তেমন ভালো হয় না। টিচাররা মাকে বলতেন যে ও নিজের সাবজেক্ট পেলে ভালো করবে। ১৪-১৫ বছর বয়স থেকে আমার একটা সিরিয়াসনেস এল। ঠিক পড়াশোনায় নয়, দেশ-কাল-সমাজ সম্পর্কে একটা চিন্তা। বন্ধু-বান্ধব-আড্ডা ছিল, কিন্তু মনটা ওগুলো থেকে

পিনাকী মিত্র

খানিকটা সরে আসছিল। পড়ার বইয়ের বাইরেও এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আরও যে অনেক মিস্টিরিয়াস জিনিস আছে, সেসব আমাকে আকর্ষণ করতে লাগল। যেমন আমার ছোটো মেয়ে এবার আইএসসি পাশ করল। খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চায়! আমাদের পরিবারে তেমন কেউ বিজ্ঞান নিয়ে পড়েনি। ও ভাবছে বায়ো-সায়েন্সের দিকে যাবে। ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মনে হল, ১৪-১৫ বছর বয়সে যারা একটু ভাবুক প্রকৃতির, তাদের নানারকম দার্শনিক চিন্তা মাথায় আসে। যেমন এই মহাবিশ্বের শেষ কোথায়, আর যেখানে শেষ সেখান থেকে কীসের শুরু? সময়ের অর্থ কী? আমাদের চারপাশের জগৎ পরিবর্তনশীল না হলে—সবকিছু যদি স্থির, অপরিবর্তিত থাকত, যদি এভাবে দিন-রাত না হত, আমাদের বয়স না হত—তাহলে কি মানুষ সময় বলে ধারণাটার উদ্ভাবনা করত? বিজ্ঞানের প্রতি ভালোলাগা ছিল, কিন্তু তার মানেই ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যেতে হবে এই প্রবণতাটা খুব মেকানিক্যাল লাগত। তাই হায়ার সেকেন্ডারি পড়ার সময় অনেক ভেবেচিন্তে বিজ্ঞান না পড়ে যাকে ইকো-স্ট্যাট কম্বিনেশন বলা হত-মানে ইকনমিক্স, অঙ্ক আর স্ট্যাটিসটিক্স-তাই নিয়ে পাঠভবন স্কুলেই আবার ভর্তি হলাম। এইসময় আমাকে খুব প্রভাবিত করেছিলেন আমাদের স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক পিনাকী মিত্র। পিনাকীদা। অঙ্কের ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। ঈশান স্কলার ছিলেন। কিন্তু নানা কারণে উনি গবেষণায় না গিয়ে পাঠভবন স্কুলে হায়ার সেকেন্ডারি স্তরে অঙ্ক আর স্ট্যাটিসটিক্স পড়াতেন। আমার অঙ্ক আর স্ট্যাটিসটিক্সের প্রতি ভালোবাসা জন্মায় পিনাকীদার জন্যই। কিন্তু পাঠ্যবই বাদ দিয়েও উনি নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন যা থেকেও অনেক কিছু শিখেছি। যেমন, ওঁর কাছেই আমি প্রথম বার্ট্রান্ড রাসেল, জন ভন নয়মান, ভিটগেনস্টাইনের মতো চিন্তাবিদদের অবদানের কথা শুনি আবার সাহিত্যে জোসেফ কনরাড বা বোর্হেসের কথাও প্রথম শুনি। আগে আমার সাহিত্য ভালো লাগত, ইতিহাস ভালো লাগত। বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই একটা দখল ছিল। যাই হোক, পিনাকীদার সংস্পর্শে আসার পর আমি সিরিয়াস হয়ে গেলাম, কিন্তু সাহিত্য ছেড়ে ঝোঁকটা অঙ্ক-স্ট্যাটিসটিক্সের দিকে গেল। এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, বিজ্ঞান নিয়ে পড়লে বেশ হত—বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা এগুলো নিয়ে জানার ইচ্ছে

আমাদের সময় ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ স্টুডেন্টজ এসোসিয়েশন বা পিসিএসএ। এদের নকশাল বলে উল্লেখ করা হলেও আমি যে সময়ের কথা বলছি তা নকশাল আন্দোলনের প্রায় দু-দশক বাদে—তখন এদের সঙ্গে বিগতযুগের সেই সশস্ত্র আন্দোলনের যোগসূত্র কিছুই ছিল না, কাজ বা মতাদর্শ কোনও দিক থেকেই।

আবার ফিরে এসেছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় অন্তত উচ্চমাধ্যমিক স্তর অবধি আর্টস বা কলাবিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদেরও খানিকটা অঙ্ক এবং বিজ্ঞান শেখা উচিত, আবার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদেরও অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস আর সাহিত্য পড়ে রাখলে ভালো। নাহলে পড়াশোনাটা খুব যান্ত্রিক ব্যাপার হয়ে যায়, পরের জীবনে সারা পৃথিবীতে কী হচ্ছে তা ভালো করে বোঝার বা জানার ক্ষমতাটা খুব সীমিত হয়ে যায়। তা ছাড়া নিজেরই কোন বিষয়টা সবচেয়ে ভালো লাগে সেটাই বোঝা যায় না প্রথম থেকেই পড়াশুনোটা খুব সংকীর্ণ খাতে বইলে।

ঠিকই। কখন যে কোন বিষয় মনে রেখাপাত করে বা কোন বিষয় কোথায় প্রভাব বিস্তার করে, ঠাহর করা যায় না।

ঠিক। আর একটা কথা বলা দরকার যে ওই ছোটো বয়সে নানা ধরনের চিন্তা-ভাবনার দিক খুলে দেবার জন্য আমি আমার স্কুল পাঠভবনের কাছে কৃতজ্ঞ। পাঠভবনে এমনিতে একটা সাংস্কৃতিক বাতাবরণ ছিল। তবে তার মধ্যে

রাবীন্দ্রিক প্রভাব খুব প্রবল ছিল, যেমন, প্রতি সকালে অ্যাসেম্বলি লাইনে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হত। আর পাঠ্যবইয়ে রবীন্দ্রকাব্য তো ছিলই। এইসব কারণে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গান একটু রুটিন লাগত। বরং জীবনানন্দ দাশের কবিতার প্রতি মুগ্ধতা ছিল। রবীন্দ্রনাথকে পাঠ্যবইয়ের বাইরে ভালোবেসে পড়া শুরু হল বিদেশ যাবার পর। যাইহোক, নিয়মের বাইরে কিছু ভাবলে বা করলে আমাদের টিচাররা কিন্তু ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিতেন না। বরং উৎসাহ দিতেন। এখন বুঝি, এটা খুব জরুরি। কাজেই পাঠভবন স্কুলের শিক্ষকদের প্রতি আমার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রয়ে গেছে।

অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

আর কোনও শিক্ষকের কথা বলবেন যিনি আপনাকে প্রভাবিত করেছেন?

দেখুন অনেক শিক্ষকই আছেন, যাঁদের কথা উল্লেখ করা উচিত। আমি দু'জনের কথা বিশেষ করে বলব, যাঁদের আমি মেন্টর বা দিকনির্দেশক বলে মনে করি।

আমার যেমন পড়াশোনার প্রতি ভালোবাসা জন্মায় পিনাকীদার জন্য, তেমন রিসার্চ বিষয়টা কী সেটা আমি জেনেছিলাম অভিজিৎদার কাছ থেকে। অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০১৯ সালে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সূত্রে এখন তাঁর নাম সবাই জানেন, কিন্তু আমি অভিজিৎদার একেবারে প্রথম দিককার ছাত্র। ওঁকে যখন প্রথম দেখি তখন আমার বয়স ২৩, অভিজিৎদার ৩০। যখন হার্ভার্ডে পড়তে যাই, তখন আমি অভিজিৎদাকে চিনতাম দীপকবাবুর ছেলে হিসেবে। দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের প্রেসিডেন্সির অর্থনীতির হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ছিলেন। দীপকবাবু ওঁর বাড়িতে আলাপও করিয়ে দিয়েছিলেন। তখন অভিজিৎদা প্রিন্সটনে পড়াতেন। আমি যে বছর হার্ভার্ডে জয়েন করলাম, সে বছর অভিজিৎদা হার্ভার্ড ভিজিট করছিলেন। তারপর হার্ভার্ডে একবছর জয়েন করে পড়ালেন, আমি তাঁর উন্নয়নের অর্থনীতি কোর্সের প্রথম ব্যাচের ছাত্র। তার পরের বছর অভিজিৎদা এমআইটি চলে গেলেন—কিন্তু সেটা হার্ভার্ডের ক্যাম্পাস থেকে হাঁটা দূরত্ব, তাই উনি আমার একজন থিসিস অ্যাডভাইসর হিসেবে থেকে যান (যদিও আমার প্রধান অ্যাডভাইসর ছিলেন এরিক ম্যাসকিন, যিনি অভিজিৎদারও অ্যাডভাইসর ছিলেন, এবং ২০০৭ সালে নোবেল প্রাইজ পান)। গবেষণার অর্থ যে নতুন কিছুর খোঁজ, এটা আমি ভালোভাবে শিখেছি অভিজিৎদার কাছে। অনেক কিছু জানা বোঝা এক জিনিস, আর গবেষণার মধ্যে দিয়ে নতুন কিছুর সন্ধান করা আরেক জিনিস। নতুন কিছু বলা কিন্তু সোজা নয়—যাই ভাবছ হয়তো অন্য কেউ সেরকম আগেই ভেবেছে এবং তা নিয়ে লিখেছে, তাই প্রথম ধাপ হল নিশ্চিত হওয়া যে যা বলছ তাতে নতুনত্ব কিছু আছে কিনা। আমাদের দেশ থেকে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে যাওয়া অনেক ছাত্র—যারা যেকোনও বিষয়ে গুছিয়ে একটা রচনা লিখে ফেলতে দড়, এই ধাপটায় অনেকসময় বেশ আটকে যায়। কিন্তু নতুন কিছু বলতে পারলেও, সেটা তোমার বিষয়ে অন্য গবেষকদের কাছে খুব প্রাসঙ্গিক বা ইন্টারেস্টিং হবে তা নাই হতে পারে। এটা হল গবেষণার দ্বিতীয় ধাপ—নিজের গবেষণাকে প্রাসঙ্গিক হতে হবে—লোকে যেন পড়ে না বলে, বাহ্ কথাটা বেশ নতুন, বুদ্ধি খাটিয়ে ভালো বের করেছ, কিন্তু এটা প্রয়োগ করে আমার বিষয়ের যে মূল প্রশ্নগুলো সেগুলো সম্পর্কে কোনও নতুন আলোকপাত করতে পারলে? তা না হলে, জেনে আমার লাভ কী হল?

গবেষণার এই ধাপগুলো কী করে পার হতে হয় আমি শিখেছি অভিজিৎদার কাছ থেকে। প্রথম দিকে এরকমও হয়েছে যে দারুণ উৎসাহ নিয়ে খেটে-খুটে কিছু একটা করে নিয়ে গেছি, অভিজিৎদা পুরো উৎসাহে জল ঢেলে দিয়ে বললেন, এটা ঠিক আছে, কিন্তু এর থেকেও ভালো কোনও আইডিয়া পাও

কিনা দেখো। প্রথম যেদিন একটা আইডিয়া শুনে বললেন যে হ্যাঁ, এটা বেশ সম্ভাবনাময়, এটা নিয়ে কাজ করো, তখন কী আনন্দ হয়েছিল এখনও মনে আছে।

পড়াশোনায় নিজেকে মোটিভেট করার কি কোনও গোল্ডেন রুল আছে?

বিষয়টার দুটো দিক আছে।

প্রথমটা হল, প্র্যাকটিক্যাল দিক। প্রথমে দেখে নিতে হবে, তুমি কোন কোন বিষয়ে ভালো আর তোমার কোন কোন বিষয় ভালো লাগে। দুটো যদি মিলে যায়, খুব ভালো। তুমি তোমার চয়েস অনুযায়ী বিষয় পেলে। তা যদি না হয়, তুমি যে বিষয়ে ভালো তার কাছাকাছি কী কী বিষয় নিয়ে তুমি এগোতে পারো দেখো। এ ছাড়া এটা জানা কথা হলেও বলা দরকার—কোনও বিষয় আয়ত্ত করতে গেলে পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই।

আর দ্বিতীয় দিকটা হল, মনের জানালাগুলো খুলে রাখা। প্রেসিডেন্সি কলেজের ক্লাসরুমগুলো তো আর খুব ঝাঁ চকচকে ছিল না! কিন্তু ওই ক্লাসরুমে বসে সারা পৃথিবীতে কী ঘটছে, তা জানতে পারতাম। কোন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ কী বলেছেন, কোন বিতর্কে কী ঘটেছিল জানতে পারতাম। দীপকবাবুর মতো শিক্ষকরা আমাদের সেসব জানাতেন। মনের জানালাগুলো খুলে দিতেন। তখন মনে হত, গোটা পৃথিবীটাই আমাদের আয়ত্তের মধ্যে। সত্যি যদি প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতি বিভাগ দেখেন, অমর্ত্য সেন এবং অভিজিৎ বিনায়ক, দু'জন নোবেল জয়ী তো আছেনই, তাছাড়া আরও অন্তত দশজন আছেন যাঁদের নাম অর্থনীতির জগতে সবাই জানেন। সুতরাং প্রয়োজন হল চিন্তা ভাবনার জানালাগুলো খুলে পড়াশোনা করা।

কলেজে পড়ার সময় আমি কিন্তু বেশ কনফিউজড ছিলাম যে এরপর কী করব? রিসার্চ করব না অন্য কিছু। তখন রাজনীতির সঙ্গে খানিকটা যুক্ত ছিলাম, লেখা-লেখির দিকে ঝোঁক ছিল। ভাগ্যক্রমে আমার রেজাল্ট খুব ভালো হয়ে যায়...

ভাগ্যক্রমে?

হ্যাঁ তাই। এখন শুনলে কেউ বলতেই পারেন কেন পরেও তো আপনার রেজাল্ট ভালোই হয়েছিল। এই সেদিন মায়ের সঙ্গে এসব নিয়ে কথা হচ্ছিল। নানারকম ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ি কলেজে, যার মধ্যে ছাত্র রাজনীতিও ছিল, তাই পড়াশুনোয় তেমন মন দিতে পারিনি কলেজ জীবনের প্রথম দেড় বছর। প্রায় ড্রপ দেবার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল!

রাজনীতি? কলেজে আপনার একটা র‍্যাডিক্যাল অবস্থান ছিল?

হ্যাঁ, আমাদের সময় ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ স্টুডেন্টজ অ্যাসোসিয়েশন বা পিসিএসএ। এদের নকশাল বলে উল্লেখ করা হলেও আমি যে সময়ের কথা বলছি তা নকশাল আন্দোলনের প্রায় দু-দশক বাদে—তখন এদের সঙ্গে বিগতযুগের সেই সশস্ত্র আন্দোলনের যোগসূত্র কিছুই ছিল না, কাজ বা মতাদর্শ কোনও দিক থেকেই। আসলে তখন রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় থাকার প্রায় এক দশক হয়ে গেছে, তাদের নানা কাজ ও নীতি নিয়ে ছাত্রমহলে অনেক বিক্ষোভ ছিল, তাই মেনস্ট্রিম বামপন্থী ছাত্র সংগঠন মানে এসএফআই—তাদের থেকে নিজেদের আলাদা করাই এই তথাকথিত র‍্যাডিক্যাল ছাত্র সংগঠনগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল। আর এটাও বলা উচিত যে আমাদের সময়ে দল যাই হোক, বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেওয়া মানে ছিল কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের মতামত জানানো, মিটিং-মিছিল-ডিবেট করা, ছাত্র সংসদের নির্বাচনে দাঁড়ানো এই সবই—সর্বস্ব পণ করে কোনও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া নয়।

তবে হ্যাঁ, বামপন্থী ভাবধারার প্রতি একটা স্বাভাবিক যোগসূত্র ছিল পারিবারিক আবহাওয়ার জন্যে। আমার বাবার ছোটোকাকা ঋত্বিক ঘটক বা আপন দিদি (আমার বড়োপিসি) মহাশ্বেতা দেবীর কথা তো মানুষ জানেনই। আমার ঠাকুরদা মণীশ ঘটক যুবনাশ্ব ছদ্মনামে গল্প-কবিতা-উপন্যাস লিখতেন, তাঁর লেখাতেও বামপন্থী মতাদর্শের ছাপ সুস্পষ্ট। আর আমার বড়োপিসির ছেলে নবারুণ ভট্টাচার্যের লেখা থেকে তো তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের কথা বোঝাই যায়। তাছাড়া আমার মায়ের পরিবারের দিক থেকেও বাম মতাদর্শের প্রভাব ছিল। আমার দাদামশাই শ্যামল চক্রবর্তী, যিনি বিদ্যাসাগর কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াতেন, তিনি প্রায় ষোল বছর অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির হোলটাইমার ছিলেন। আমি মূলত বড়ো হয়েছি আমার মায়ের পৈতৃক বাড়িতে যেখানে বাম দর্শন, অর্থনীতি ও

ইতিহাসের যত বই ছিল তাতে একটা ছোটোখাটো গ্রন্থাগার ভরে যাবে।

পরবর্তীকালে আমার প্রচলিত বাম রাজনীতির সঙ্গে একটা মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়। তার একটা কারণ তো আশির দশকের শেষ থেকে বিশ্বজোড়া নানা ঘটনা যাতে প্রমাণিত হয় সমাজতন্ত্র বলে যে ব্যবস্থাটা সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীনের মতো দেশে চালু ছিল তা নড়বড়ে ছিল, তার অনেক সমস্যা ছিল। কিন্তু তা ছাড়াও স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা ও মত প্রকাশের যে গণতান্ত্রিক অধিকার তার প্রতি বামেদের অসহিষ্ণুতা, যেটা এখনও আছে, সেটা নিয়েও আমি বহুদিন অস্বস্তি বোধ করি।

মতাদর্শগতভাবে এখনও আমি বাম রাজনীতির প্রতি সহানুভূতিশীল কারণ তারা সমাজের দরিদ্র এবং প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের অধিকার নিয়ে সত্যিই দায়বদ্ধ। কিন্তু লড়াই তো শুধু মানুষকে অন্ন-বাসস্থান দেওয়া নিয়ে নয়, তার সঙ্গে মানুষের স্বাধীনভাবে চিন্তা ও মত প্রকাশের এবং জীবনযাপনের স্বাধীনতাও তাকে দিতে হবে। আর কেউ অন্য মত প্রকাশ করলেই সে খারাপ লোক হয়ে যায় না, তার নিজস্ব চিন্তা এবং অভিজ্ঞতা থেকে সে সেই অবস্থানে এসেছে। তাই সে ঠিক না আমি ঠিক সেটা কে বিচার করবে? আমার তো মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে আমি ঠিক, এবং তার মনে হবে সে ঠিক, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার না করলে কে ঠিক সেটা ঠিক করা যাবে না। তার জন্যে দরকার আলোচনা, অন্যদের মত নেওয়া, আরও ভাবনাচিন্তা ও পড়াশুনো করা। উলটো মতের কথা ভালো না লাগলেও শোনা উচিত। কারণ আমাদের সীমিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের কারণে কারও পক্ষেই সবকিছু জানা সম্ভব নয়। শুধু সমমনস্ক লোকেদের সঙ্গে কথা বললে, নিজের ভাবনাচিন্তা একটা জায়গায় আটকে থাকে।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রথম চাকরি ছিল। লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স, ইয়েলেও অফার ছিল। শিকাগো মুক্তবাজারপন্থী অর্থনীতির পীঠস্থান বলে সুপরিচিত, সেখানে আমার এমনিতে যাবার কথা না। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম ক্ল্যাসিক্যাল লিবারালিজমের সর্বোচ্চস্তরের চিন্তাবিদদের সংস্পর্শে আসতে যাতে আমার চিন্তার জগৎটা বিস্তারলাভ করে। এর ফলে নিজের চিন্তার জগৎটাকে উন্নত করানোর সুযোগ পাব, যেটা অন্য কোথাও পাব না। শিকাগোতে কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা খুব মসৃণ ছিল না—আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাভাবনার ধরণ সবকিছুর থেকেই খুব আলাদা একটা পরিবেশ। কিন্তু ভারতের পিচে ব্যাটিং শিখে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পিচে ফাস্ট বোলিং খেলতে গেলে প্রথমে অসুবিধে হয়, কিন্তু তাতে নিজের ব্যাটিং-টা ইমপ্রুভ করা যায়, শিকাগোর অধ্যায়টা খানিকটা সেই ভূমিকা পালন করেছে আমার ক্ষেত্রে।

তার মানে এ মুহূর্তে অসহিষ্ণুতা বিষয়টা আপনাকে সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছে!

হ্যাঁ। রাজনৈতিক, সামাজিক সব ক্ষেত্রে। দেখুন, আমাদের সবার প্রবণতা হল পরিচিত গণ্ডির মধ্যে থেকে আরামবোধ করা। কিন্তু এর সমস্যা হল, সবাই যদি একইভাবে ভাবে তাহলে নতুন চিন্তা আসবে কোথা থেকে? বা, আমাদের নিজস্ব চিন্তাগুলো ঠিক না ভুল বুঝব কী করে? তাই কেউ একমত হলে একটা আপাত আরামবোধ হয় ঠিকই, কিন্তু আমাদের উচিত অন্যরকম মত ও চিন্তাও শোনা। তার মানে যে যা বলছে শুনতে হবে তা নয়। আমি যেমন যিনি সামাজিক সাম্যে বিশ্বাস করেন না—সে ধর্মের দিক দিয়ে হোক, বা নারী-পুরুষ বা অন্য যেকোনও সামাজিক শ্রেণিই হোক—তার সঙ্গে আলোচনা করার কোনও জায়গাই দেখি না। সেরকম, কেউ যদি সব মানুষের মূল গণতান্ত্রিক অধিকারে বিশ্বাস না করেন, কোথাও মানুষের ওপর অন্যায় অত্যাচার হয়েছে শুনলে সেটার সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করেন তাঁর সঙ্গেই বা কী আলোচনা করা যেতে পারে? বাঘের সঙ্গে তো আর শাকাহারী হবার সুফল আলোচনা করার মানে হয় না!

আমাদের দেশে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক এখন আমূল বদলে গেছে। বিদেশের পরিস্থিতি কী?

বিদেশে শিক্ষা বিষয়টা অনেক বেশি প্রোফেশনাল। আপনি যদি কোনও শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করতে যান তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে। ঠিক যেমন আপনি ডাক্তার বা অন্য যে কোনও পেশার কারও সঙ্গে দেখা করতে গেলে করে থাকেন। হয়তো আপনার সঙ্গে তাঁর খুব ভালো সম্পর্ক, হয়তো গত রাতে আপনি তাঁর সঙ্গে কোনও অনুষ্ঠানে ডিনার করেছেন, তিনি পরদিন সকাল দশটায় সময় দিয়েছেন দেখা করার ও আপনি তাতে সম্মত হয়েছেন। এবার আপনি যদি ব্যক্তিগত চেনা থাকার সুবাদে সকাল ৯টার সময় গিয়ে হাজির হন, তবে আপনাকে এক ঘণ্টা বসতে হবে। আর বলাই বাহুল্য দেরি করে গেলে সেটা একেবারেই ভালো চোখে দেখা হবে না। তবে উলটোটাও সত্যি—অধ্যাপকের কাছেও প্রত্যাশা যে তিনি সময় দিলে ঠিক সময়ে অপেক্ষা করবেন, শেষ মুহূর্তে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করে দেবেন না। ফলে প্রথম থেকেই মিউচুয়াল এক্সপেকটেশনটা পরিষ্কার হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, ওখানে যেমন এখানের মতো পরীক্ষা হয়, ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন হয়, উলটো ব্যবস্থাও চালু আছে। ওখানে শিক্ষকদের কাজেরও ইভ্যালুয়েশন আছে এবং তা করে ছাত্র-ছাত্রীরা। আমি বিলেত ও আমেরিকায় যতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি ও পড়িয়েছি প্রত্যেকটিতেই এই শিক্ষক-ইভ্যালুয়েশন আছে। সে তিনি যতই ডাকসাইটে শিক্ষক হন বা নোবেল লরিয়েট হন, কোর্স শেষ হবার কয়েক

সপ্তাহ আগে তাঁকে গম্ভীর মুখে ক্লাসে নিজের ইভ্যালুয়েশন ফর্ম বিলোতে হবে। এখন অবশ্য সব অনলাইন হয়ে গেছে। তারপর সেই কয়েকপাতা জোড়া ফর্মে একেবারে কোর্স ধরে ধরে ছাত্র ছাত্রীরা লেখে কোন শিক্ষকের পড়ানোর কোন দিকটা তাদের ভালো লেগেছে কোন দিকটা লাগেনি, আর কোথায় কোথায় ইমপ্রুভমেন্টের জায়গা আছে।

এবং, এটা করার সময় তাদের নিজেদের নাম লিখতে হয় না, তাই দেখে শিক্ষক চটে গিয়ে পরীক্ষায় তাকে কম নম্বর দেবেন এই ভয় নেই। এক্ষেত্রে নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি এই প্রক্রিয়ার একটা মূল্য আছে। ধরা যাক, ক্লাসের ১০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী আমার অন্ধ প্রশংসা করল যে আমার মতো শিক্ষক তারা সারা জীবনে পায়নি। আবার ১০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী খুব বিরূপ মন্তব্য করল—খুব একঘেয়ে, ভালো করে বুঝিয়ে বলেন না এরকম কিছু। কিন্তু ওই ২০ শতাংশ সরিয়ে রেখে বাকি ৮০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী যা বলল, তা ভালো করে পড়ে দেখলে সত্যি একটা ছবি ফুটে ওঠে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম প্রথম হালকা সমালোচনাগুলো পড়েও আমার গায়ে লাগত। মনে হত এত খেটে-খুটে পড়ালাম, অথচ এরকম বলল। পরে মনে হয়েছে, হয়তো ওই প্রশ্নের উত্তরটা আমার আরেকটু বিশদে দেওয়া উচিত ছিল, আমি একটু তাড়াহুড়ো করেছি। বা, অনেক কথা বলেছি যা হয়তো এই ছাত্রদের যে জ্ঞানের পরিধি, তার তুলনায় একটু বেশি শক্ত হয়ে গেছে।

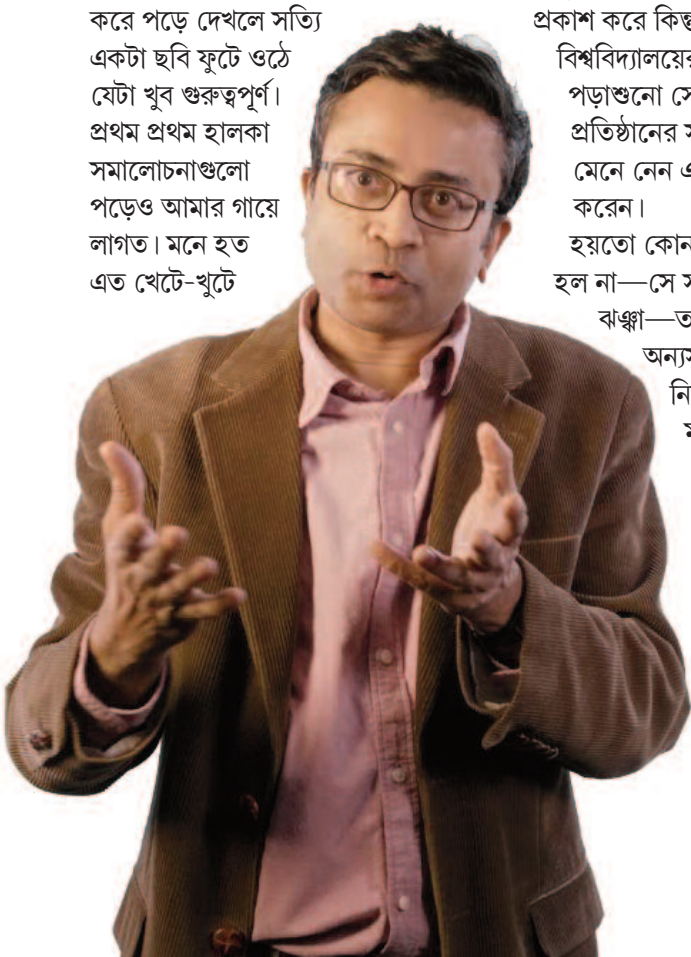

এখানের সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয় এখানের ব্যবস্থাটা বড্ড একপেশে—কোনও শিক্ষক ভালো না পড়ালে তার কোনওরকম প্রতিকার নেই। অথচ, শিক্ষকের ওপর ছাত্র-ছাত্রীদের নম্বর পাওয়া ও কেরিয়ার অনেকটাই নির্ভরশীল। তাই সম্পর্কটা খুবই অসম। যদি কোনও কারণে শিক্ষকের বিরাগ ভাজন হয় একজন ছাত্র বা ছাত্রী, তবে তার কেরিয়ারে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

বিদেশে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে রাজনৈতিক নেতা বা দল নিশ্চয়ই নাক গলায় না?

না একদম নেই। ছাত্ররা রাজনৈতিক ইস্যুতে প্রতিবাদ করে, তাদের মত প্রকাশ করে কিন্তু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য যে পড়াশুনো সেটা ছাত্র, শিক্ষক এবং প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের সব কর্মীই মেনে নেন এবং সেটা সম্মান করেন।

হয়তো কোনও কারণে একদিন ক্লাস হল না—সে স্ট্রাইক হোক বা ঝড়-ঝঞ্ঝা—তখন আরেকদিন অন্যসময় সেই ক্লাসটা করে নিতে হবে, সেটা সবাই মানেন। আর মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর ক্যাম্পাসে উপস্থিতি কখনও চোখে পড়েনি, তবে নানারকমের ছাত্র সংগঠন (তার মধ্যে বামপন্থীদের প্রাধান্য বেশি) এবং ক্যাম্পাসে তাদের নানা কর্মসূচি চোখে পড়ে।

বাবা হিসেবে কন্যাদের আপনি কোন কোন মূল্যবোধের কথা প্রথমে বলবেন?

আমি প্রথম বলি যে, সবসময় নিজে যা করতে চাইছ, তাই যদি করো, নিজে যেটা খেলতে চাইছ, বাকিরাও সেটাই খেলবে সেইটা চাও, তাহলে কিন্তু দিনের শেষে তুমি খুব একলা হয়ে যাবে। কাউকে তুমি খেলার সাথি হিসেবে পাবে না। তবে উলটোটাও সত্যি—সব সময়ে অন্যদের কী ভালো লাগবে ভেবে নিজের ভালো লাগাটা চেপে রাখলে ভেতরে যে বিক্ষোভ জমবে তাও নিজের বা অন্যদের কারও জন্যেই ভালো নয়। এখানে একটা ভারসাম্য রেখে চলতে হবে।

আর দ্বিতীয় যেটা বলি, তা হল, প্রত্যেকটা মানুষকে সম্মান দিতে হবে, তার প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। এই নীতিটা নিজের ভালোর জন্যও জরুরি। কারণ সম্মান দিলে মানুষের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাওয়া যায়। নিজের বৃত্তের মধ্যে অনেকেই হয়তো তুমি খারাপ ব্যবহার করলেও চুপ করে সহ্য করে যাবেন, কিন্তু সারাজীবন তো আর তুমি একই বৃত্তে থাকবে না—যেখানে তোমাকে বা তোমার বাড়ির কাউকে কেউ চেনে না, সেখানে তোমার ব্যবহারই তোমার পরিচয়।

আমাদের বাড়িতে এই ব্যাপারটা সবসময় ছিল। আমার বাবা নিজের পড়াশোনা ও কাজের জগতে থাকতেন, আমরা মায়ের কাছেই বড়ো হয়েছি। কিন্তু বাবা ভীষণ রেগে যেতেন যদি দেখতেন বাড়িতে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের সঙ্গে খারাপ করে কথা বলেছি বা খারাপ ব্যবহার করেছি। কোনও ড্রাইভার বা রান্নার লোক এলেন হয়তো, যদি তিনি বয়স্ক হন, তাঁকে বাড়ির সবাই আপনি বলত (অনেকদিনের আলাপে অনেকসময় আপনিটা তুমি হয়ে যায়)। ভালো ব্যবহারের কোনও বিকল্প নেই, সে আপনি বোলপুরে থাকুন বা বস্টনে।

আমাদের ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবার পাঠ যতটা দেওয়া হয়, ভালো ব্যবহারের পাঠ ততটা দেওয়া হয় না। জানি না, কীভাবে এগুলো শিশুদের শেখানো যাবে! মনে হয়, তাদের কাছে যে মেসেজটা দেওয়া হচ্ছে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হলে তবেই তারা সেটা মানবে—আপনি যদি মুখে বলেন তুমি সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, কিন্তু কাজে যেখানে আপনার ক্ষমতা দেখানোর সুযোগ আছে (যেমন, বাড়িতে যাঁরা কাজ করেন), তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন, তাহলে আর শিশুরা কী শিখবে?

আর শেষ যেটা বলি, সেটা হল, তোমার একটাই জীবন, তাই অন্যের কী ভালো লাগবে অন্যে কী চাইছে সেই অনুযায়ী নিজের জীবনে বেঁচো না। কোনও না কোনও সময় তার থেকে যে ফ্রাস্ট্রেশন তৈরি হবে তার ফল কারও জন্যেই ভালো হবে না। নিজের কী ভালো লাগে, সেটা খুঁজে বার করাটাই জীবনের একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। তবে, এ কথাটার উলটো পিঠ হল—তোমার জীবনে যা হচ্ছে, তার দায়িত্ব নিজে নাও—নিজের পথে হেঁটে ভালো না লাগলে অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ো না। নিজের কাজের ফলের দায়িত্ব নিজে না নিলে কোনওদিন শুধরাবার অবকাশ থাকবে না।

অবসরে কী করেন?

আমাদের কাজের জীবনে দুটো জিনিস ব্যালেন্স করতে হয়—আমার কী করতে ভালো লাগে আর আমি কীসে ভালো। আমার সৌভাগ্য যে আমার ক্ষেত্রে এই দিকগুলোর মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই আর তাই কাজ আর অবসরের মধ্যে তেমন কোনও সীমারেখা নেই। আমি যে গবেষণা বা লেখালিখির কাজ করি তা আমার করতে ভালোও লাগে—তাই সেটা কাজ মনে হয় না। তবে সব কাজেরই (এমনকী অবসরেরও) একটা একঘেয়েমি ও ক্লান্তির দিক আছে। তাই

আমাদের বাড়িতে এই ব্যাপারটা সবসময় ছিল। আমার বাবা নিজের পড়াশোনা ও কাজের জগতে থাকতেন, আমরা মায়ের কাছেই বড়ো হয়েছি। কিন্তু বাবা ভীষণ রেগে যেতেন যদি দেখতেন বাড়িতে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের সঙ্গে খারাপ করে কথা বলেছি বা খারাপ ব্যবহার করেছি। কোনও ড্রাইভার বা রান্নার লোক এলেন হয়তো, যদি তিনি বয়স্ক হন, তাঁকে বাড়ির সবাই আপনি বলত (অনেকদিনের আলাপে অনেকসময় আপনিটা তুমি হয়ে যায়)।

যখন পড়াশুনো করতে, লিখতে বা ভাবতে ইচ্ছে করে না, তখন বই পড়ি, সিনেমা দেখি, হাঁটতে যাই, সাঁতার কাটি, রান্না করি। খেলাধুলো আগে দেখতাম, এখন অতটা দেখা হয় না।

নিজে খেলতেন?

খুব একটা নয়। আমাদের স্কুলে খেলার মাঠ ছিল না। ওই পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট ফুটবল। তা ছাড়া বাড়ির ছাদে, রাস্তায়, গলিতে যখন যেমন সুযোগ পেতাম—শহরে বড়ো হলে যেমনটা হয়। তবে মা আমাদের দুই ভাইকে পদ্মপুকুর সুইমিং ক্লাবে ভরতি করিয়ে দিয়েছিল। খেলায় আমার জীবনে একমাত্র মেডেল যে আছে, তা ওই সাঁতারের সূত্রেই!! আর ১৯৮৬-তে আমার হায়ার সেকেন্ডারির বছরে টিভিতে প্রথম লাইভ বিশ্বকাপ দেখার সুযোগ হল। সেই যে আন্তর্জাতিক ফুটবলের মান দেখলাম—তার মধ্যে মারাদোনার জাদু তো ছিলই, তার পর থেকে স্থানীয় ফুটবলে খানিক উৎসাহ হারালাম। তবে ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার ছিলাম। সম্প্রতি সুরজিৎ সেনগুপ্তর মৃত্যুর খবরে পুরোনো স্মৃতি সব মনে আসছিল।

প্রবাসের জীবন, কলকাতা মিস করেন?

আমি কলকাতায় থাকি না ঠিকই, কিন্তু আমি কলকাতার সঙ্গেই থাকি। গত আড়াই বছর তো অতিমারির কারণে সব লন্ডভন্ড হয়ে গেছিল। নাহলে বছরে অন্তত তিনবার এসে সব মিলিয়ে কয়েকমাস ধরে আমি কলকাতায় থাকি। আমি তো ঠাট্টা করে নিজেকে বলি, এনআরআই নই, আমি পিআরআই—পার্ট টাইম রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া! কলকাতায় কী হচ্ছে না হচ্ছে, কলেজ স্ট্রিটে নতুন কী বই আসছে, কী সিনেমা হচ্ছে, কোথায় কোন নতুন ক্যাফে বা রেস্তোরাঁ বা বইয়ের দোকান খুলল, সব খোঁজ রাখি। তবে বন্ধু-বান্ধবরা নানা জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। সবসময় দেখা হয় না, এই যা।

কলকাতা সম্পর্কে কী মিস করি বললে আড্ডা আর খাওয়াদাওয়া তো প্রথমেই আসবে। তবে আড্ডা প্রসঙ্গে কলকাতার বাইরে থাকার সূত্রে একটা কথা মনে হয়—সেটা হল এখানে অনেক জায়গায় একটা আত্মমগ্নতা বা ইনসুলারিটির ভাব দেখতে পাই। নিজেদের পরিচিত বৃত্তের বাইরে কোথায় কী হচ্ছে—সে শহরের বাইরে রাজ্যের অন্যত্রই হোক বা দেশের নানা প্রান্তেই হোক বা বিদেশ, সে সম্পর্কে জানার উৎসাহ অতটা চোখে পড়ে না।

তবে যে জিনিসগুলো আগেও ভালো লাগত এবং এখন বেশি করে মনে হয় তা হল কলকাতার দৈনন্দিন জীবনে রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষের ভদ্র ব্যবহার বা সাহায্য করার প্রবণতা। তা সত্যিই এই শহরটাকে আলাদা করে। আর হল রসবোধ— পথেঘাটে বা আড্ডায় বাঙালির রসবোধের তুলনা মেলা ভার।